অল্প কথায় গল্প

ভারতী চৌধুরী

মুখবন্ধ

আমাদের সকলের জীবনেই কিছু না কিছু গল্প লুকিয়ে থাকে। গল্পের আকার ও আয়তন পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল। চায়ের আসরের গল্প, অবসরবিনোদনের জমাটি আড্ডা ক্ষুদ্রগল্পের নথিভুক্ত এবং তা বক্তাদের কাছে মুখরোচক ও শ্রোতাদের কাছে শ্রুতিমধুর। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত গল্পগুলিকে ছোটোগল্পের আখ্যা দেওয়া হয়। ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত গল্প এবং উপন্যাস বড়ো গল্পের পর্য্যায়ভুক্ত। যে ভাবেই হোক আমাদের বইবাতিকের পাঠকদের কাছে গল্পগুচ্ছ চিরকালই সুখপাঠ্য এবং স্বাদেবোধে পরিপূর্ণ।

মাত্র বারোটি গল্প দিয়ে গাঁথা আমার গল্পমালা 'অল্প কথায় গল্প' উপহার দিলাম আমার পাঠকবৃন্দকে। এই গল্পগুলি বিভিন্ন ছাঁচে নির্মিত। দীর্ঘকালীন অভিজ্ঞতাসঞ্চয়ে মনুষ্যচরিত্রের নানাবিধ দিক আমি উন্মোচন করেছি ও তার মধ্য দিয়ে সামাজিক সচেতনতাকে সুদৃঢ় করবার চেষ্টা করেছি। প্রকৃতির প্রতিশোধে অপরাধীদের দুষ্টচক্রের অবসান, আধুনিক পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে প্রকৃত দোষী ব্যক্তির অন্বেষণলাভ, বিদেশের মাটিতে ভারতীয় বাঙালির বিদেশি সমাজের বিচিত্র রহস্যের মুখোমুখি হয়ে তার কুহেলীবিলীন হওয়ার রোমাঞ্চকর অধ্যায়গুলিকে আমার গল্পে সজীব ও প্রাণবন্ত করে তুলবার চেষ্টা করেছি। এই গল্পগুলির অন্তরালে লুকিয়ে আছে একটি স্বচ্ছ মূল্যবোধের বাণীপ্রচারের চেষ্টা। আমার এই বইখানি পাঠকের মনকে সঞ্জীবিত ও আনন্দদান করবে এই আশা অবিচ্ছেদ্য।

আমার এই শুভকাজে প্রেরণাসঞ্চার করেছেন শ্রীমতী মীনাক্ষী সিংহ; গল্পলেখার আলোচনায় উদ্দীপিত করেছেন শ্রীমতী অনীতা অধিকারী। এইসব অধ্যাপিকাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানালাম। গল্পলেখনীর কাজে চরম উৎসাহপ্রদান করেছেন আমার স্বামী কান্তিভূষণ চৌধুরী। আশাকরি আমার গল্পসম্ভারের ভাষা ও রচনাশৈলী পাঠকদের রুচিসম্মত হবে। ভবিষ্যতে আমার পাঠককুলের কাছে আমি তাদের মুখনিঃসৃত অভিজ্ঞতার গল্প শুনতে চাই। সর্বোপরি পুনশ্চ প্রকাশনীর কর্ণধার শ্রীসন্দীপ নায়ককেও আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলাম কারণ এই প্রকাশনীর সহযোগিতা ব্যতীত আমার এই গল্প লেখার প্রচেষ্টা বাস্তবায়িত হতো না। নমস্কারান্তে,

জানুয়ারি, ২০১৮

বিনীত
ভারতী চৌধুরী

গ ল্প সূ চি

সওয়াল জবাব / ৯
শ্রেষ্ঠ উপহার / ১৫
থাইল্যান্ডের পথে পথে / ২৭
নালিশের খাতা / ৪১
বিধাতার বিধিলিপি / ৫৪
ফাঁকি / ৬১
পুনশ্চ / ৬৯
ডাইনী-মা / ৭৫
ভাই যতীন / ৮৭
বিলাতের আগন্তুক / ৯৯
অটোগ্র্যাফ / ১১১
হারানো সুর / ১২২

॥ সওয়াল জবাব ॥

পৃথিবীতে এমন কয়েকটি পাপকার্যের নিদর্শন আছে সংসারজগতে যা ক্ষমার অযোগ্য। এইসব পাপের প্রতিবিধানও নেই অথচ পাপীকে শাস্তি দেবার জন্য সুযোগ্য হাতিয়ারও সমাজজীবনে মেলে না। অযথা নিরপরাধ লোকদের পাপাচারীর লাঞ্ছনার শিকার হয়ে দিন গুজরান করতে হয়। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে অন্যায়ের তেজ স্তিমিত হয়ে আসে কিন্তু অদৃশ্য ঘটনার পাকচক্র অনাচারকে অদৃশ্য রাখে না, অপরাধীকে সওয়ালজবাবের মুখে নিক্ষেপ করে ছাড়ে।

কর্মজীবন থেকে অবসরগ্রহণের পর আমি লেখনীর কাজে আত্মোৎসর্গ করেছি। দেশ বিদেশের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখা, কবিতা, প্রবন্ধ ও গল্পের বইপ্রকাশ এবং বিভিন্ন সাহিত্যপত্রিকার আলোচনাতে যোগদান করে বেশ খ্যাতি অর্জন করেছি। লেখিকার সৃষ্টিসুখে ব্যবসায়ী পেশার মতো পার্থিব গৌরব নেই। কিন্তু অন্তরের অন্তঃস্থলে কোথায় একটা স্বর্গীয় আনন্দ অনুভব করে নিজস্ব রচনাগুচ্ছকে পাঠকদের ঝাঁপিতে উৎসর্গ করতে পারলেই যেন পূর্ণতার উপলব্ধি হয়। ডাক্তার যেমন বিভিন্ন রোগের প্রতিবিধানের জন্য রোগীদের সেবাকার্যে লেগে তাদের সান্নিধ্যে আসে সেরকম মনুষ্যসমাজের ঘূর্ণায়মান সংসারচক্রের মধ্যে আবর্তিত হয়ে লেখকের অভিজ্ঞতার কাহিনিও বিচিত্ররূপ ধারণ করে। যুগসঞ্চিত সেই কাহিনিসম্ভারের একটি ছোটো অংশ আজ তুলে ধরছি।

করুণা রায় ছিল আমাদের স্কুল ও কলেজের সহপাঠী ও মেধাবী ছাত্রী। আমরা সমবয়সি এবং আচরণের দিক থেকেও সমগোত্রীয় ছিলাম। করুণা জলপানি নিয়ে রসায়নে ডক্টরেট করতে আমেরিকা চলে যায়। বিদেশবাসী হয়েও পত্রালাভের সুঅভ্যাসটি সে বেশ বজায় রেখেছিল। সেজন্যই সুদূর আমেরিকা থেকে আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক না থাকলেও স্বচ্ছ যোগাযোগ ও বন্ধুত্বটুকু অটুট ছিল। তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। গবেষণায় উন্নত

ডিগ্রীপ্রাপ্ত হয়ে করুণা ভারতবর্ষে ফিরে আসে এবং পশ্চিমবঙ্গের বাইরে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা ও গবেষণার কাজে নিযুক্ত হয়। প্রায় কুড়ি বছর পর হঠাৎ একদিন কলকাতার মাটিতে কলেজের পুনর্মিলন উৎসবে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়। ইতিমধ্যে আমি বিয়ে করে পরিবার রচনা করেছি কিন্তু করুণাকে দেখলাম যে সে অবিবাহিতই রয়ে গেছে। কলকাতায় থাকাকালীন নিয়মিত দেখাসাক্ষাতের আসরে একদিন করুণা তার জীবনচরিত শোনাতে লাগল।

আমেরিকাতে অমিত মিত্র নামে কেরালার এক বাঙালি ছাত্রের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। অমিতও রসায়নে গবেষণার জন্য আমেরিকাতে আসে। দুইজনে একই বিষয়ের ছাত্র হওয়াতে পড়াশুনার আলোচনার খাতিরে সহজেই আলিঙ্গনবদ্ধ হয়ে পড়ে। এই প্রাণের আদানপ্রদানে সময় নষ্ট হবার পরিবর্তে সময়ের যথোচিত সদ্ব্যবহার হত। আমেরিকার মাটিতে দুইজন ভারতীয় বাঙালি যুবক-যুবতীর সান্নিধ্য বিদ্যাচর্চার গণ্ডী অতিক্রম করে নিবিড় প্রেমবন্ধনে ধরা দিল। অমিত ছিল করুণার চাইতে তিন বছরের বড়ো এবং বাইরের নানাকাজে বিদেশের নির্জন পরবাসে সে করুণাকে সাহায্য করত। পৃথিবীতে এমন কয়েকটি পুরুষব্যক্তিত্ব দেখা যায় যারা বাক্‌ভঙ্গিমার নৈপুণ্যে সহজেই নারীদের মন জয় করে ফেলে। অমিত ছিল সেই জাতেরই একটি মানুষ এবং সহজেই সেই মনুষ্যপক্ষীটি করুণার স্বচ্ছ সরল অন্তরে নীড় বেঁধে বসল। দুজনেই সিদ্ধান্ত নিল যে ভারতবর্ষে ফিরে গিয়ে সামাজিক মর্যাদায় তারা বিয়ে করবে।

করুণার ডক্টরেট ডিগ্রী পাবার পরও অমিতের গবেষণার কাজ অসমাপ্ত রয়ে গেল। করুণা তখন দেশে ফিরে আসে এবং বিদেশের সেই সম্মানিত ডিগ্রীর সঙ্গে নিয়ে আসে অমিতের সঙ্গে শুভপরিণয়ের সোনালী প্রতিশ্রুতি। এই ঘটনাটিও প্রায় তিরিশ বছর আগেকার যখন ই-মেইলের আবির্ভাব মানুষের যোগাযোগটিকে আজকের পৃথিবীর মতন ত্বরান্বিত করতে পারেনি। করুণা-অমিতের যোগাযোগের হাতিয়ারই রয়ে গেল পত্রবিনিময় কারণ সেযুগের দেবদাসদের পার্বতীর চিঠির জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে হত। যৌবনের উচ্ছ্বাস সময়ের ব্যবধান মানে না; যেখানে একটি চিঠি লিখবার প্রয়োজন সেখানে করুণা সেই সময়ের দূরত্বকে দূরে ঠেলে আরও চারটি চিঠি লিখে বসত। অমিতের চিঠি আসবার সময় ডাকবিভাগের নিয়মানুবর্তিতায় নিয়ন্ত্রিত কিন্তু করুণার লেখনীর অস্ত্র তো করুণারই হাতে।

অমিতের অদর্শনের বেদনা, প্রিয়তমকে কাছে পাবার উদগ্র অতৃপ্তি, তাদের আসন্ন বিবাহমন্ত্রের সুখের আশ্বাস সবকিছুই যেন করুণার পত্রগুচ্ছের মধ্যেই প্রতিফলিত হতো। কিছুদিনপর তার প্রেমিকপ্রবর অমিতের আচরণ যেন পত্রালাপের মধ্যে ধীরে ধীরে অনেকটা সংযত মনে হতে লাগল। চিঠির উত্তর দেবার জন্যই যেন অমিতের চিঠি আসে কিন্তু সে পত্রগুচ্ছে যৌবনের প্রাণস্পন্দনের আলোড়ন দেখা যায় না। দুরদেশে বসে থেকে করুণার অভাব যেন অমিতকে নিস্তেজ রাখে না। মেয়েদের বিয়ে করবার একটি সময় ও বয়স থাকে। সে দিকটা বিবেচনা করে করুণার পরিবারও তার বিয়ের প্রস্তুতি নিতে লাগল এবং অমিতের সম্ভাব্য ফিরে আসবার খবরটা তারা ক্রমাগত করুণার কাছেই জিজ্ঞাসা করতে লাগল। সাধারণত প্রেমবিবাহের ক্ষেত্রে পুরুষের উদ্যোগই বিয়ের উচ্ছ্বাসে অগ্রণী হয়, নারীরা সলজ্জকাতর থাকে। এক্ষেত্রে বিপরীত ঘটনাই ঘটল। এই ব্যাপারে অমিতের নীরবতা করুণার মনকে নাড়া দিল এবং সে চিত্রাঙ্গদার মতনই পুরুষের বীর্যে অমিতকে চিঠিতেই বিয়ের প্রস্তাবটি উত্থাপন করে বসল। অমিত তখন এক আশ্চর্য দাবী করে বসে। সে লিখল যে করুণার বাবাই যেন অমিতের মাকে যোগাযোগ করে তাদের বিয়ের প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন এবং এই বিয়ের ব্যাপারে তার মায়ের মতটি জানতে চান। অমিত ছিল তার বাবামায়ের একমাত্র সন্তান এবং সেজন্যই তার ছেলের বিয়ের ব্যাপারে অমিতের মায়ের পছন্দের দায়বদ্ধতাকেই সে সর্বাগ্রে স্থান দিতে চায়। অমিতের এই সিদ্ধান্ত কিন্তু প্রেমবিবাহের ছকের মধ্যে পড়ে না। করুণা সন্দিগ্ধচিত্তে অস্বস্তিবোধ করলেও তার বাবাকে রাজি করিয়ে অমিতের মাকে চিঠি লেখালো। পত্রপাঠ কড়া জবাবে অমিতের মা বিয়ের প্রস্তাবটি নাকচ করে দিলেন। তাঁর একান্ত ইচ্ছা যে তার একমাত্র পুত্র অমিত মায়ের নির্বাচিত পাত্রীকেই বিয়ে করুক। অমিত-করুণার দীর্ঘকালীন প্রেম-ইতিহাসের সেখানেই সমাপ্তি। করুণার কোমল হৃদয় প্রথম প্রেমের তিক্ততায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে জীবন থেকে বিয়ের পরিকল্পনাই ত্যাগ করল। বিলেতের সুখস্বর্গের বিচরণ তার কাছে মরীচিকার মতনই অলীক বলে মনে হল। প্রথম যৌবনের যে প্রেম প্রহসন হয়ে করুণাকে দগ্ধ করেছিল করুণা তাকে সাময়িকভাবে কাতর হয়ে পড়লেও সেই অশুভশক্তির কাছে পরাজয় স্বীকার করেনি। সে উপলব্ধি করেছিল যে শুধুমাত্র প্রণয়লিপ্সা ও বৈবাহিক সুখই জীবনধর্মের শেষকথা নয়, জীবনের উদ্দামগতিকে রক্ষা করবার অন্যান্য সামগ্রীরত্নও তো আছে। বিদুষী করুণা গবেষণার কাজে কৃতিত্ব ও সম্মান অর্জন করে জীবনের অগ্রগতির পথটি বেছে নিল।

তারপর বহুদিন কেটে গেছে। করুণা ইতিমধ্যে অমিতের কোনো সন্ধানও পায়নি এবং সে ব্যাপারে সে আগ্রহীও ছিল না। হঠাৎ কোনও একটি বিশ্বস্ত সূত্রে তার কাছে খবর আসে যে অমিত তার ডক্টরেট ডিগ্রীটি শেষ করতে বিফল হয়ে তার বিদেশে থাকবার অনুমোদিত ছাত্রভিসার সময়টিও শেষ করে ফেলেছিল। সেই সময়েই সে আমেরিকার নাগরিক স্থায়ী বাসিন্দা একজন তরুণী তন্বী ইরানী মহিলার সংস্পর্শে আসে। সে অত্যন্ত ধনীও বটে কারণ তাদের পরিবারের আন্তর্জাতিক স্বর্ণব্যবসা আছে। অমিত সেই ইরানী মহিলাকে বিয়ে করে আমেরিকাতে তার থাকবার ব্যবস্থাটি পাকা করে ফেলে। করুণা আরও জানতে পারল যে ওই ইরানী মুসলমান মেয়েটির সঙ্গে যখন অমিতের ঘনিষ্ঠতা চলছিল সেই সময়টিতে করুণার পত্রনিক্ষেপের চাপে অতিষ্ঠ হয়ে করুণার লেখা কয়েকটি প্রেমাপ্লুত হৃদয়ের চিঠি তার মাকে ডাকযোগে পাঠিয়ে দেয়। অমিত তার মাকে অনুরোধ করেছিল যে তিনি যেন করুণার বাবার বিবাহপ্রস্তাবটি নাকচ করে দেন। অমিতের নাকি করুণার প্রতি কোনো আকর্ষণই নেই এবং কোনোদিন ছিলও না। করুণাই তাকে অযথা বিরক্ত করছে। পুত্রস্নেহে অন্ধ অমিতের মা ছেলের কথাই বিশ্বাস করেছিলেন ইতিমধ্যে তিনিও গত হয়েছেন কিন্তু স্বর্গলাভের আগে এই একমাত্র সুপুত্রের মুখখানি দেখবার সৌভাগ্য তার হয়নি। একটি অযাচিত চাতুরীর কুচক্র করুণাকে ভবিষ্যৎ জীবনের সংসার-সন্তান-স্বামীপ্রেমের ধারাবাহিকতা থেকে বঞ্চিত করল। সবকিছু শুনে আমি রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে বলে উঠলাম 'করুণা, জানিস হাতের কাছে পেলে ওই নরাধমকে আমি শেষ করে ফেলতাম।' করুণার মুখে মলিন হাসি ফুটে উঠল। সে তখন শান্তমনে বলল 'একমাত্র প্রকৃতির প্রতিশোধই মানুষকে সমুচিত শিক্ষাদান করতে পারে, মানুষ পারে না'। হঠাৎ আমি পুরোনো বান্ধবীর কাছে একটা প্রস্তাব আনলাম 'তোর এই জীবনচরিতটি যদি আমি উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলতে পারি, তাতে তোর সম্মতি আছে তো?' করুণার জবাব আসে 'তোর মতো সুলেখিকার সুপ্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করবার সাহস আমার আছে কি? তবে আসল নামগুলি যেন তুই আবার প্রকাশ করিস না।' তখন কলকাতার বাজারে বেশ কয়েকবছর ধরে 'বসুধা' নামক একটি প্রকাশনী সংস্থা খুব খ্যাতি অর্জন করেছিল যার প্রতিষ্ঠাতার নাম ছিল বিনয় বসু। বসুধার সেই মালিক বিনয়বাবু ছিলেন অত্যন্ত বিনম্রস্বভাবের। শোনা যায় অনেক বছর বিদেশে থেকে বহুমুখী অভিজ্ঞতাসঞ্চয় করে তিনি এই বসুধার প্রতিষ্ঠাতা হয়েছেন।

লেখক-লেখিকারা পাণ্ডুলিপি জমা দিলে বসুধায় নিযুক্ত অন্যান্যরাই তা পরীক্ষা করে প্রকাশযোগ্য হবার সিদ্ধান্ত নেন এবং বিনয়বাবু কিন্তু তাতে আপত্তি তোলেন না। তিনি নানাবিধ জনকল্যাণমূলক কাজে এতই ব্যস্ত থাকেন যে প্রকাশিত বইগুলির ওপর একবার করে চোখ বুলানোর সময়ও পান না। সকলের সঙ্গে সুব্যবহারের খাতিরে বিনয়বাবুর সুনামটিও অনেকের কাছেই সুপরিচিত এবং অক্ষুণ্ণ থাকত।

আমি যে উপন্যাসটি লিখলাম তার নামকরণ করলাম 'সওয়ালজবাব'; কারণ করুণার অপরাজেয় মানসিক শক্তি ও গবেষণাপ্রতিভা অমিতের ঝুঁটো প্রেমকে উপেক্ষা করে একটি ফুঁকো শিক্ষিত লোককে অগ্রাহ্য করেছিল। জীবনযুদ্ধে অপরাজেয় থেকে মানসিক ক্ষমতাসম্পন্ন শক্তিময়ী এই নারী সংসারমঞ্চে উপযুক্ত জবাবনিক্ষেপ করেছে। বইখানি বাজারে ছাড়বামাত্রই ধন্য ধন্য পড়ে গেল। নানা সংবাদপত্রে তার বিজ্ঞাপন, সমালোচনা ও রিভিউ দেখে বইবাতিকের পাঠকেরা বইখানি পড়বার জন্য অধীর ও উৎসুক হয়ে পড়ল। অবশেষে দেখা গেল যে গুণমুগ্ধ পাঠককুলের প্রশংসার হিল্লোলে 'সওয়ালজবাব' বাংলা অ্যাকাডেমিতে পুরস্কৃত হবার জন্য বিবেচিত হয়েছে। আমি এই চমৎকৃত সুসংবাদটি পাওয়ামাত্রই করুণাকে অনুরোধ করলাম সে যেন পুরস্কার বিতরণীর দিনটিতে সশরীরে সেখানে উপস্থিত থাকে। ইতিমধ্যে আমি বসুধার কর্তা বিনয়বাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম 'আপনি কি আমার এক বান্ধবীর সাথে দেখা করবেন? তার জীবনচিত্রই তো আমার আজকের এই উপন্যাসের মূল উপজীব্য এবং সেজন্যই এই বইখানিকে আমার সেই বান্ধবীকে উৎসর্গ করেছি।' বিনয়বাবু অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে এই সাক্ষাতের অনুমতি দিলেন।

যথাসময়ে নির্ধারিত দিনে করুণা আমার হাত ধরে বিনয়বাবুর অফিসের লাল গালিচা আবৃত, শীততাপনিয়ন্ত্রিত সুসজ্জিত ঘরখানিতে প্রবেশ করল। বিনয়বাবুর পাকাচুল কলপের আবরণে আবৃত থাকত। নিয়মিত ব্যায়াম ও শরীর চর্চার সুঅভ্যাসে তিনি তার গৌরবর্ণ সুঠাম দেহটিকে সতেজ রেখেছিলেন। তার সদাপ্রফুল্ল মুখাবয়বের শ্রীটুকু কখনও তাকে প্রৌঢ়ত্বের গণ্ডি অতিক্রম করতে দেয়নি। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমার পক্ককেশী করুণা বান্ধবীর ভিতরে বাইরে এক হয়ে তার কুঞ্চিত মুখশ্রী প্রকৃত বয়সের চেহারাটি স্পষ্ট করে দেয়। প্রথমে কিছুক্ষণ পরস্পর দৃষ্টিবিনিময় করলেন। তারপর হাসিমুখে ভদ্রতামূলক নমস্কারবিনিময়ের পালা সাঙ্গ হল। আমার বান্ধবী হঠাৎ বলে